শিব্রাম রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনায়

শিবরাম চক্রবর্তী

বলে গেছেন উপনিষদ
আরাম নাহি অল্পে।
বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ
শিবরামের গল্পে।।

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ হাসির রাজা শিবরাম॥

হাসতে হাসতে ছড়া, পড়তে পড়তে—
ইচ্ছা হতো শিবরামের, হাসির রাজা হতে।
শিবরাম থেকে হয়েছিলেন শিব্রাম
হাসির ছড়া লিখতেন অবিরাম,
কিশোর নবীন, তরুণ প্রবীণ
সকলে পড়ত ছড়া প্রতিদিন,
দেওয়ালের গায়ে লিখতে তাদের নাম
যারা যেত তোমার কাছে, দিতে তাদের দাম।
আজ তুমি নাই আছে তোমার লেখা ছড়া
আর আছে, অমর নাম দেওয়াল ভরা।
মুক্তারামের মেসে, ছিলে তুমি হেসে
কাঠের তক্তা, পুরানো কাগজ ভালোবাসে।
কামনা করি, তোমার মত আসুক অজস্র কবি
আমরা যেন ফিরে পাই, পুরানদিনের রবি।

—দীপক আচার্য

কলিকাতা

সম্রাট শিব্রাম সমীপেষু

[আজকাল ১৪ই মার্চ]

কয়েকটি বালক হজমি, চানাচুর জাতীয় কিছু দুর্লভ খাবারের প্ররোচনায় আপনাকে ঠকিয়েছিল তা আমরা বিস্মৃত হইনি। হাসির প্রবাদ পুরুষ শিব্রাম ওইসব বালকের রুল টানা খাতায় মার্জিন রেখে বেশ কয়েকটি গল্প লিখে দিয়েছিলেন, আমরা জানি। বালকেরা দ্রুত কিশোর-তরুণ-যুবক পর্যায় নিঃশেষ করে গেরস্থ হয়ে পড়ে এবং ইত্যবসরে সেইসব মহামূল্যবান খাতাগুলিও লোপাট। অনুমান তারা খাতা বেচে দিয়ে সিনেমার টিকিট সংগ্রহ করেছিল। এই নির্দয় কথাটি উচ্চারণের যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করলেও শেষ পর্যন্ত তো স্বীকারোক্তি করতেই হয়। এসবের ফাঁকে সম্রাট আপনি কখন 'আশি(সি)'বলে চলে গিয়েছেন। একটি ভাষার উচ্চারণ, বানান ও অর্থ-কে বিস্ফোরক কৌতুকে দেখা ও ভাবা নমনীয় উপাদানের মতো এই ভাষা স্রোতটি যোগ্য আঙ্গুলের চাপ ও চালনায় কত অদ্ভুত ভাস্কর্য গড়া যায় এইসব আমাদের পুঁজি হয়ে রইল। ননসেন্স কত অর্থপূর্ণ হতে পারে, খর বুদ্ধিতে উজ্জ্বল হাসি, তেরচা শ্লেষ— হাসির এই মানচিত্রে উইট্ স্যাটায়ার বা ভয়ঙ্কর অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের পতনজনিত হাসির মানচিত্রে আপনাকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছি। আপনার ব্যক্তিত্ব, স্ব-ভাব ম্যালিস স্যাটায়ার শর-বৃদ্ধি জানে না। বীরবল পরশুরাম থেকে পরিমল গোস্বামী পর্যন্ত হাস্যরসের বর্ণাঢ্য মিছিলে আপনাকে না দেখে যতটুকু হতাশ হয়েছিলাম মুক্তারামবাবুর গলিতে একটি চারপায়ায় আপনার ঢিলে রূপটি দেখে সেইরকমই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, স্মরণ আছে। শব্দগর্জনের এই শহরে, বাজারের এত নিকটে ওই রকম দ্বীপ আমি আর দেখিনি।

তারপর বাংলা গদ্যে গভীর ও চিন্তাশীল কিছু রচনার প্রয়াস অনেকবার আমাদের হাসি উস্কে দিয়েছে। কিন্তু এ হাসিতে সেই ঝরণা বালকত্ব নেই। নেই অবাধ, মুক্ত কোনো দিগন্ত। উল্টোদিকে গল্পের আগে বোল্ড টাইপে মুদ্রিত "হাসির গল্প" দু-মলাটের অভ্যন্তর তছনছ করে ভয়ঙ্কর শ্রান্ত হয়েছি। আপনার স্তুতি পর্বেও আমার মধ্যে এই যে তেতোভাব, এই মালিন্য আপনি মার্জনা করবেন। অতীতের সেই প্রতারক বালকদেরই একজন আমি। পরিবেশের সঙ্গে একক যুদ্ধের পৌরাণিক বীরত্ব আমার নেই। কিন্তু পরিবেশের হাঁ-মুখে নিজের পতন, মৃত্যু দেখে আতঙ্কে চামড়া কুঁচকে আসছে। পুনরায় বাঁচতে, শরীরে মনে জ্যান্ত বেঁচে উঠতে আপনার নিঃসঙ্গতার মাধুর্যময় সঙ্গ দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের তথ্যপঞ্জির পর্বত-ওজন ধূলিস্যাৎ করে স্বচ্ছ ও গতিশীল এই স্মৃতির কাছাকাছি যেতে চাই।

সহস্র এক বাঙালি সন্তানের মতো ইতিহাসের হাতে তামাক সেবনের কোনো দুর্বলতা আপনার ছিল না, আত্মজীবনীতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি নজিরহীন সেই মহতী ধর্ম। ঐতিহাসিক সঙ্ঘর্ষ, গুরুগম্ভীর জাতীয় আন্দোলন, ওজনদার ভাবাদর্শ সমস্তই আপনার সহাস্য প্রতিবেদনে স্বাভাবিক এক জীবন প্রবাহ। রাবড়ি চূর্ণের মতো দুর্লভ খাদ্যদ্রব্যের, বেতন নিবারক বিছানা ও মার্বেল থেরাপির মতো চিকিৎসা পদ্ধতি, হর্ষবর্ধন গোবর্ধন ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের আবিষ্কর্তা যে আপনি-ই পঞ্চাশ বছর পরে সেকথা বাঙালি ভুলে যাবে, হায়! রচনাবলির প্রথম খণ্ডে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন আছেন আটাত্তর পৃষ্ঠা-ব্যাপী কলকাতার হালচালে। কলকাতা সম্পর্কে 'সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়' বাসলীলা পর্বে হর্ষবর্ধন গোবর্ধন চিন্তিত। দশটি ধাক্কার এই এপিকের পটভূমি কলকাতা থেকে ইতালি পর্যন্ত বিস্তৃত। আসামের জঙ্গলে চিরটাকাল কাটিয়ে হর্ষ-গোবরের টাকা কম হয়নি, এবার কিছু কমান দরকার বলেই শহরে অভিযান। বাস, সেলুন, ডেন্টিস্ট, নিউজপেপারের শহরে ছিটকে পড়ে দু-ভাই বিমূঢ় ইতালিতে তিন হাজার বছরের মমি দেখা তক এই বিমূঢ়ভাব কার্যকর। বহুলপঠিত এই একটি রচনা, বা শিব্রামের যে কোনো রচনার পুনর্কথনে কোনো রস সৃষ্টি সম্ভব নয়। কথকের সর্বস্বত্ব এমন কৌশলে রক্ষিত যে তাঁর বচনে শোনা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।

আপনি লিখেছেন ঃ 'সার্কাসের ক্লাউন' যেমন সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা হল দক্ষযজ্ঞ ভাঙার। সব খেলাই সে জানে, সর্ব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কি হয়ে যায়, খেলাটা হাসিল হয় না, হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়। কিন্তু আমি তা পেরেচি কি!

আপনি বলেই কপট বিনয়ের অভিযোগ উঠবে না, উঠবে ওই ক্লাউন প্রশ্ন, জাত ক্লাউনের প্রশ্ন। আমাদের এই প্রিয় গ্রহে স্বেচ্ছায়, আনন্দে, বহু শিল্পী ক্লাউন ভূমিকা বেছে নিয়েছিলেন। খর্বাকৃতি একটি মানুষের কথা কেউ ভুলবেন না, হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি। পিকাসোর মতো শিল্পী সার্কাসের ক্লাউনের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর ছবি আঁকার একটি পর্ব। এদের সকলের স্মৃতি হানা দিচ্ছে সম্রাট, হায় কেন ইংরেজি ভাষায় আপনার রচনা অনূদিত হল না। হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা তারের খেলার বিষাদে (সঙ্কলনের ষষ্ঠ গল্প) একটি চোখ হেঁসে ওঠে অপর চোখে কেন জল থাকে? এরকম হাজার এক ঘাবড়ে যাওয়া, আবিষ্কার; অ্যান্টিক সংগ্রহ অভিযান হাতি সংগ্রহ পর্যন্ত বিস্ফারিত হওয়ার যে ক্লাউন চোখ আপনার ছিল, আপনার কি উচিত ছিল না সম্রাট ওই চোখ-দুটি আমাদের চক্ষু সংগ্রহ ভাণ্ডারে দান করে যাওয়া? আপনার পরবর্তী খণ্ডের জন্য অপেক্ষা। বিনীত.....।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

- হর্ষবর্ধনের টোটকা ৯
- ঐতিহাসিক ১৪
- কানার পাশেই খোঁড়া ১৫
- গোরু খোঁজা ১৬
- হাতিকে হাতিয়ো না দাদা ১৮
- হর্ষবর্ধনের তাজ্জব ২১
- আয়নার বায়না ২৭
- সব লোপাট ২৯
- খুকুর ভাবনা ৩১
- কথা শিল্পী ৩২
- কিশোরদের জন্য প্রার্থনা ৩৩
- আগমনী ৩৪
- কৌতুকী ৩৪
- হাঁদারামের দাদা ৩৫
- খোকার আবদার ৪২
- পাখোরাজ ছেলে ৪৩
- দারোগাবাবু জলপথে আসবেন ৪৮
- কাণ্ড নয় প্রকাণ্ড ৫৬
- ডাক্তারের হাতে রক্ষা নেই ৬৪
- চিকিৎসার কাপ্তেনি ৭৮
- রিগি পাহাড়ের চূড়ান্ত ৮৯
- চিকিৎসায় বিশ্রাম নেই ১০১
- কাজীর বিচার যাকে বলে ১১০
- শ্রীমান টম ১১৫
- বাড়ি থেকে পালিয়ের পর ১২৬
- প্রাণকেষ্টর কাণ্ড ২১৪
- এক স্বর্ণঘটিত অপকীর্তি ২২২
- রোমান্স ২৩৪
- সহযাত্রী ২৪০

হর্ষবর্ধনের টোটকা

সেই সাতসকালে—তখনো আমি ধরাশায়ী, ধরাশায়ী ঠিক না হলেও ধরণীর সঙ্গে সমান্তরালে বালিশের ধরাবাঁধার ভেতরে বিছানার উপরেই শায়িত—শ্রীমান গোবর্ধনচন্দ্র এসে হাজির।

'এই যে গোবরা ভায়া! কি মনে করে এই সাত-সকালে হঠাৎ?

'সাতসকাল নয় এখন, সাড়ে আটসকাল।' হাতঘড়ি দেখে সে বাতলায়, 'দাদা ডেকেছেন আপনাকে। ভারী জরুরি দরকার। চলুন।'

'কী দরকার?'

'হাত ব্যথা করছে দাদার।'

'তাই নাকি?' তা পা ব্যথাও করেছে নাকি তার?

'না, পায়ের কিছু হয়নি এখনও পর্যন্ত।'

'পা যখন ভালো আছে, তখন তার নিজের আসতে বাধাটা কি হল? দেখ ভাই, আমি তো এখনো ঘুম থেকে উঠিনি, হাফ ঘুমুচ্ছি। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে এমন ক্লান্ত যে, হাঁফ ছাড়বার ফুরসত পাইনি এখনো। এমতাবস্থায় এই সাড়ে আটসকালে কী করে ওই চেতলায় যাই? আর কী করেই বা আমার উচ্চরক্ত-চাপ নিয়ে তোমাদের তেতলায় উঠি গিয়ে? এই বয়সে অমন চাপল্য কি শোভা পায় আর আমার? বল।'

আমি কী বলব! দাদার হাত ব্যথা করছে যে—'

শুনে শুনে আর স্থির থাকতে পারি না বিছানায়— তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠি। এক কথা সাতবার শুনতে ভালো লাগে না আমার।

'হাত ব্যথা তার আমি কি করব?' চাড় দিয়ে উঠি, উঠে গায়ে শার্ট চড়াই, বলি, 'দেখাতে হবে ডাক্তারকে।'

'দাদা বললেন যে, আপনি লেখক মানুষ, কলম চালিয়ে খান আপনি.....তাই.....'

'কলম তো হাতের কী!' আমি বাধা দিয়ে কই।

'আহা, ওই হাতেরই ব্যাপার তো! হাত নড়লে তবে তো কলম নড়ে। তাই দাদা বললেন যে, উনি হাতের বিষয়ে হয়তো বিশেষজ্ঞ হবেন, কোনো টোটকা দাবাই-টাবাই জানা থাকতে পারে আপনার। সেই কারণে—

'চল যাই।' আমি আর কথা বাড়াই না—ওদের মোটরে উঠি গিয়ে—সটান গিয়ে দাঁড়াই সেই চেতলায়।

'কী ব্যাপার?'

'কী যে হল আমার এই হাতটার মশাই!' হর্ষবর্ধন কন বিমর্ষভাবে।

'রামডাক্তারের কাছে যান না। দেখান না তাঁকে।'

'ও বাবা!' শুনেই তিনি দুবার চমকান, 'ওই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে? তাহলে আর আস্ত থাকবে না এই হাত—প্ল্যাস্টার বেঁধে ছেড়ে দেবেন নির্ঘাত!'

'তাহলে চলুন, কোনো পলিক্লিনিকে যাই না হয়।' আমি শুধাই, 'পলিক্লিনিক জানেন তো?'

'পলিকে জানব না? বলেন কি! একগাল হাসি দেখি তাঁর,

'আপনার নাতিকে আর জানিনে আমি? কতবার আমার কাছে এসেছে সে। খাসা ছেলে পলি!'

'আহা, সে পলি নয়। সেই পলি ছাড়া কি আর অন্য পলি আপনি জানেন না?' আমি বলি।

'জানব না কেন? মনোপলি জানি। আমাদের যেমন ওই কাঠের কারবারের মনোপলি। একচেটে ব্যবসা যাকে বলে! একেবারে আকাঠ মশাই বুঝলেন?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাই হোক পলিক্লিনিক হল যেখানে কিনা এক জায়গায় সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে থাকে সর্ব রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন যেখানে।'

'চলুন তবে সেখানেই।',

আমরা বেরিয়ে পড়লাম তৎক্ষণাৎ।

নামজাদা এক পলিক্লিনিকে যাওয়া হল। সেখানে এক জায়গাতেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক এবং দন্ত থেকে অনন্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা।

যে কামরাটায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে গুরু-গম্ভীর এক ডাক্তার ব্যক্তি বসে। গোড়াতেই তিনি কড়কড়ে বত্রিশটি টাকা তাঁর ফি বাজিয়ে নিলেন। তারপর হর্ষবর্ধনকে বাজাতে বসলেন।

হাতের টাকার মতন হাতের টোকায় বাজাতে লাগলেন তাঁর বুক পিঠ। টেম্পারেচার নেওয়া হল তাঁর। থার্মোমিটারের পর স্টেথিস্কোপ দিয়ে দেখা হল। তাঁর কথায় চোখ উলটেজিভ পালটে দেখাতে হল। এমনকি আলজিভটাও না দেখে তিনি ছাড়লেন না।

আপাদমস্তক সমস্ত দেখে শুনে রিপোর্টের খাতায় টুকে নিয়ে তিনি বললেন, 'ট্রাবলটা কী আপনার?'

'ট্রাবল এই হাতে।' হর্ষবর্ধন হাতটা দেখালেন।

ডাক্তার নাড়ি দেখার চেষ্টা করতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'নাড়ির ভেতর কিছু হয়নি। নাড়িভুঁড়িতে কোনো গলদ নেই আমার। ভুঁড়িটা আমার একটু মোটা—এমনিতেই। শুধু এই হাতটা কেমন যেন ব্যথাচ্ছে আমার সকাল থেকে।'

'হাত ব্যথা করছে? দেখি আপনার দাঁত দেখি।'

দাঁতের উপর চোখ কেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, 'হাতের সঙ্গে দাঁতের কী সম্পর্ক?'

'দাঁত খারাপ থাকলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। সেই এক দোষ থেকেই হরেক উপসর্গ দেখা দেয়।'

'চোখও পরীক্ষা করতে হবে নাকি ওঁকেআবার?' আমি শুধাই।

'হতেও পারে। আগে রক্তটা দিন আপনার।' বলে রক্ত নেবার সিরিঞ্জটা বার করেন ডাক্তার।

'অ্যাঁ? রক্ত? রক্তও দিতে হবে?' আঁতকে উঠেন হর্ষবর্ধন, 'রক্তপাতও করতে হবে আবার?'

'কোনো ভয় নেই। একটুও লাগবে না আপনার। টুক করে তুলে নেব দেখবেন। টেরও পাবেন না আপনি।' ভরসা দেন ডাক্তারবাবু।

আপাদমস্তক সর্বাঙ্গের সবরকম পরীক্ষা করালেন হর্ষবর্ধন, বুক পেট পিঠ হাত পা দাঁত—কোনোটার বাদ গেল না তাঁর। এমনকি, তাঁর ব্লাডপ্রেশারও টের পাওয়া হল তারপর। তাঁর ওজন এবং বিশেষ বিবরণও নিলেন ডাক্তাররা।

সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে, দেখে শুনে শ পাঁচেকের মতো খসিয়ে হর্ষবর্ধন নিজের হাত ধরে বাড়ি ফিরলেন—যেমন গেছলেন ঠিক তেমনি কাতরাতে কাতরাতে।

কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থাই হল না সেদিন। বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে—যিনি

সবার উপরওয়ালা সবসেরা অলরাউন্ড ফিজিসিয়ান—সঙ্গে মুলাকাতও হল না এমনকি!

রাস্তায় দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমাদের কথা শুনে একজন বললে আর্নিকা খেতে, ত্রিশ থেকে তিনশো শক্তি অবধি যা খুশি। আরেক জন বললে চুন হলুদ গরম করে লাগাতে।

তৃতীয় এক ব্যক্তি, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন, পথের মধ্যে উপচে-পড়া আমাদের কথা শুনে উপর চড়াও হয়ে বলে গেলেন, 'আর কিছু নয়, আশ্চর্য মলম। আশ্চর্য জিনিস মশাই! লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই আরাম।'

এই মতদ্বৈধ নাকি মতত্রৈধের মধ্যে কোন্ ব্যবস্থাটা যে বৈধ কি করে তার আঁচ পাব না আঁচান থাকলে?

আমি বললাম, 'খুব বড়ো ডাক্তার দেখাচ্ছেন উনি। বিধিসম্মত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। ওসব টোটকা-টুটকির কম্মো না ভাই।'

'তাহলে শুধু ডাক্তারেই শানাবে না বন্ধু! শেষ পর্যন্ত সার্জনের কাছেই যেতে হবে।' একজন জানালে, 'বলেছিলাম ভালো কথা, এক ডোজ আর্নিকাতেই সেরে যেত একদিনে, ভুগতে হত না রোজ রোজ। শুনলে না! অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের খপ্পরে পড়ছ যখন, তখন আর দেখতে হবে না!' রেহাই পাচ্ছ না সহজে খপ্ করে। তোমার ওই হাত আওড়াবে, পাকবে, ফুলবে, ফুলে ঢোল হবে। তারপর পচতে শুরু করবে। পচন ধরবার পর সার্জন এসে তোমার হাজার টাকা খসিয়ে নেবার পর কেটে বাদ দিতে হবে হাত। অপারেশন অবশ্যি বেশ সাকসেসফুলই হবে, তা বলাই বাহুল্য! তবে তোমাকে পটল তুলতে হবে ওই অপারেশনের টেবিলেই!'

ওই কথা শুনেই হর্ষবর্ধনের হাতের যন্ত্রণা বেড়ে গেল সাত গুণ। অমন ব্যথাতেও একটুখানি গুমরাতেও ভুলে গেলেন তিনি। কেমন গুম হয়ে গেলেন।

'আমার পক্ষাঘাত হয়েছে।' বাড়ি ফিরে কেবল এই কথা বলেই বিছানায় তিনি কাত হয়ে পড়লেন। আজ কোনো উচ্চবাচ্য নেই তাঁর।

পরদিন সকালে আমরা পলিক্লিনিকে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি, রিপোর্ট টিপোর্ট রেডি। সব রকমের রিপোর্ট। ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদি যাবতীয় পরীক্ষার ফলাফল এসে গেছে। মায় এক্স-রে ফটোর কপিও।

অতঃপর সবার বড়ো সেই ডাক্তারসাহেবের কাছে যেতে হল। গিয়ে সবার আগে তাঁর টেবিলের উপর ফিয়ের একশো কুড়ি টাকা জমা রেখে জিজ্ঞাসুভাবে আমরা তটস্থ হলাম!

'দেখলাম সব।' বললেন ডাক্তারসাহেব, 'কিছুই হয়নি আপনার। খানিকক্ষণ গরম জলে হাত ডুবিয়ে রাখুন গে কব্জি অব্দি, তাহলেই সেরে যাবে মনে হয়।'

'ব্যথা না হয় সারল। কিন্তু ফোস্কা?' হর্ষবর্ধন ওস্কান।

'কীসের ফোস্কা?' ফোঁস করে ওঠেন ডাক্তার-সাহেব। তাঁকে একটু অবাক দেখা যায় যেন।